ভারতে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বনির্ভর বৃদ্ধির পথ কী?

মৈত্রীশ ঘটক

এক

জাতীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে সরকার নানা উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও (যেমন, কর্পোরেট কর কমানো যাতে বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগ) কর্পোরেট সংস্থাগুলো নতুন বিনিয়োগে অনীহা দেখাচ্ছে। তার প্রমাণ হল গত এক দশক ধরে জাতীয় আয়ে বিনিয়োগের অনুপাত নিম্নগামীই থেকেছে। এবং বিনিয়োগ যথেষ্ট হারে না বাড়লে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হারের যে মন্থর গতি কোভিড সংকটের কয়েক বছর আগে থেকেই চোখে পড়ছিল, তা পাল্টাবে না।

প্রশ্ন হল, কেন জাতীয় আয়ের অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ছে না? কর্পোরেট বা বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করে লাভের প্রত্যাশায় এবং সেখানে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যাশিত চাহিদা বৃদ্ধির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধে মূলধারার অর্থনীতির আলোচনায় যা সবসময়ে উপযুক্ত গুরুত্ব পায় না, সেরকম একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব— আয়বণ্টন এবং চাহিদার বিন্যাসের ধরনের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর্থিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটিকে চালনা করে, সেইখানে সমস্যা থাকলে অর্থনীতির পালে প্রাথমিকভাবে যত জোরেই হাওয়ার দমকা লাগুক, ক্রমশ আর্থিক বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে যেতে বাধ্য।

এটাকে আরও গভীরে বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় আপাত বা প্রত্যাশিত চাহিদার ভূমিকাটা ঠিক কীরকম। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হোক বা নতুন বাজার তৈরি, বৃদ্ধির যে-কোনও ভরবেগকে সবসময় প্রথম থেকেই নতুন চাহিদাস্রোত তৈরি করতে হবে, তা না-হলে বৃদ্ধির ক্ষণজীবী হয়ে থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অর্থাৎ, বৃদ্ধির প্রক্রিয়া স্থায়ী হতে চাইলে এমন একটি স্বনির্ভর

প্রক্রিয়ার প্রয়োজন যাতে জোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই অর্থনীতির চাকায় বেগ সঞ্চারিত হবে।

কেউ বলতেই পারেন, চাহিদার জন্যে দেশীয় বাজারের ওপর নির্ভর করার কী দরকার, পূর্ব-এশীয় অর্থনীতিগুলির 'রপ্তানি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন' মডেলটি থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় না কি? অবশ্যই, পূর্ব-এশীয় অর্থনীতিগুলির অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে— কী করে তারা কয়েক দশকের ব্যবধানে তুলনামূলকভাবে নিম্ন উৎপাদনশীল অর্থনীতিকে আমূল পাল্টে ফেলে একটি উচ্চ উৎপাদনশীল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করল? পূর্ব-এশীয় অর্থনীতিগুলি এটা দেখতে পেয়েছিল যে বেশি বিত্তশালী দেশগুলিতে চাহিদার এক বিরাট খনি নিহিত আছে সদ্ব্যবহারের অপেক্ষায়। তারা বুঝেছিল, এই চাহিদাকে কাজে লাগাতে পারলে নিজেদেরকে খাদ থেকে টেনে তুলতে পারবে তারা। কৌশলটা খুবই সরল: প্রাথমিক পণ্য, অর্থাৎ সরাসরি ব্যবহারযোগ্য পণ্য রপ্তানি দিয়ে শুরু করো, উন্নত দেশগুলি থেকে প্রযুক্তি কেনো, নিজেদের শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করো, সস্তা দেশীয় শ্রমশক্তির সাহায্যে তুলনামূলকভাবে সস্তা পণ্য প্রস্তুত করো, এবং তারপর সেই পণ্য দিয়ে ভাসিয়ে দাও উন্নত দেশের বাজার। পূর্ব-এশীয় শ্রমশক্তি যত অনিয়মিত ক্ষেত্র (কম উৎপাদনশীল) থেকে নিয়মিত ক্ষেত্রে (বেশি উৎপাদনশীল) উঠে আসতে লাগল, তাদের আয়ও বৃদ্ধি পেল এবং সেই সঙ্গে অন্তর্দেশীয় চাহিদাও। মোট শ্রমশক্তির অধিকতর পরিমাণ উচ্চ উৎপাদনশীল কাজকর্মে যুক্ত হতে শুরু করার কারণে বিকাশও এল দ্রুতগতিতে।

দেশীয় সংস্থাগুলি অচেনা জলে নামতে তথা বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করতে শুধুমাত্র তখনই সাহস পাবে যদি তারা নিশ্চিত হতে পারে যে তাদের পণ্যের একটা বাজার আছে। উন্নত দেশগুলির বাজারে প্রচলিত পণ্যের তুলনায় কম দামে ভালো পণ্য যদি তারা নিয়মিত উৎপাদন করে যেতে পারে, তবে এই ঝুঁকিটা নিতে তারা বেশি আশ্বস্ত বোধ করবে। এভাবে অর্থনীতি যখন বদলায়, জাতীয় আয় এবং তার জেরে অন্তর্দেশীয় চাহিদাও বাড়তে থাকে, যা তাদের আরও কিছুটা আত্মবিশ্বাস জোগায়।

কিন্তু এইরকম একটা প্রক্রিয়া ঘটার প্রথম পূর্বশর্তটাই হল যে সদ্ব্যবহার করার জন্য একটা বড়সড় পরিমাণ চাহিদা বাজারে থাকতে হবে। যেসব ছোট ছোট দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে 'এশিয়ান টাইগারস্' নামে পরিচিত হবে, তাদের তরফে এই কৌশল রূপায়ণের পক্ষে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়টি অনুকূল ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চিন এই রঙ্গমঞ্চে উঠে আসে নব্বইয়ের দশকে। ২০০০ সালে তারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেয় এবং উপরোক্ত কৌশলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে শুরু করে। ১০ বছরের মধ্যে সারা দুনিয়ার বাজার ছেয়ে যায় তাদের রপ্তানিকৃত পণ্যে

এবং একটা দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত হারে উন্নয়নশীল দেশ হয়ে থাকতে পেরেছিল চিন।

রপ্তানি-কেন্দ্রিক বৃদ্ধির কৌশল নিঃসন্দেহে আকর্ষক। সেন্টার ফর মনিটরিং দ্য ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই) সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে প্রায় দু'দশক ধরে তুলনামূলকভাবে উচ্চ বৃদ্ধির হার থাকলেও গড়ে ভারতের উপভোক্তাদের ৬০ শতাংশ ব্যয় এখনও খাদ্য এবং শক্তি এই দুই খাতেই হয়। জনসংখ্যার নিচের অর্ধটিতে এই হার প্রায় ৭০ শতাংশ। ভারতে পণ্য ও পরিষেবার দেশীয় বাজারটি এই অত্যাবশ্যক পণ্যগুলির বাইরে এখনও বেশ সীমিতই বলা চলে। কাজেই রপ্তানির বাজার খুলে গেলে সীমিত দেশীয় চাহিদার সমস্যাটি লাঘব হয়।

কিন্তু ভারতের মতো একটা দেশ— বস্তুত যে-কোনও দেশের পক্ষেই— এখন এশিয়ান টাইগারদের মডেলটি অনুসরণ করা এক কঠিন কাজ, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারের বেশিরভাগটাই দখল করে বসে আছে চিন। বাংলাদেশের মতো ছোট দেশগুলির পক্ষে তাও বস্ত্রশিল্পের মতো কোনও একটা বিশেষ খাতে দক্ষতা বাড়িয়ে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু ভারতের মতো বিরাট দেশের পক্ষে এটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া, রপ্তানি-কেন্দ্রিক বৃদ্ধিতে বাদ সাধবার মতো এমন একাধিক সমস্যা আছে যা একান্তই ভারত-কেন্দ্রিক।

প্রথমত, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল বাণিজ্য নীতির দিকে একটা সুস্পষ্ট ঝোঁক দেখা যাচ্ছে যা আন্তর্জাতিক জোগান শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলিকে ভারতে আসা থেকে নিরুৎসাহ করতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত, শ্রম এবং জমি সংক্রান্ত আমাদের যা আইনাবলী আছে তাতে যে অর্থনৈতিক সাম্য বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কোনওদিকেই বিশেষ লাভ হয় না সেকথা মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত হলেও, আমাদের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সেইসব আইনকে সুস্পষ্টভাবে সংস্কারও করে উঠতে পারেনি। এইধরনের সংস্কারগুলি ছাড়া এত বড় মাত্রায় উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা অসম্ভব যাতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় নামা যায়।

তাহলে উপায়?

রপ্তানিকে সামনে রেখে উন্নয়নের প্রয়াসকে নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাতে হবে, কিন্তু পাশাপাশি একটা সমান্তরাল পথ চিনে রাখাও জরুরি। হালফিলে দেশীয় চাহিদা নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, শুধু দেশীয় চাহিদার ওপর নির্ভর করতে হলে বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি ঠিক কী হবে?

দুই

কোভিড সংকট ও তার থেকে পুনরুদ্ধার দূরে রেখে যদি দীর্ঘসূত্রী দৃষ্টিতে আমরা বিষয়টা দেখি, প্রথমেই বলতে হবে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফটওয়্যার পরিষেবা বা অন্য কোনও পণ্য বা পরিষেবার জোরালো চাহিদা আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। গত এক দশকে জাতীয় আয়ে রপ্তানির অনুপাত নিম্নগামী। এখন ভারতীয় অর্থনীতিতে যদি আবার একটা জোরদার চাহিদার জোয়ার আসতে হয়, কোথা থেকে তা আসবে?

আর্থিক বৃদ্ধি, তজ্জনিত লাভের বণ্টন, তার থেকে সঞ্চারিত চাহিদার বিন্যাস, এবং তার থেকে অন্যত্র আয়বৃদ্ধি, তার লাভের বণ্টন, তার থেকে চাহিদার ধরন— আমাদের তাত্ত্বিক কাঠামো এই যে প্রক্রিয়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ভারতের ক্ষেত্রে সেটাকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার স্বার্থে একবার দেখে নেওয়া যাক একদম উপরতলায় উপার্জনের চেহারাগুলো ঠিক কীরকম।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে আমরা সিএমআইই-র উপভোক্তা ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেখব। যেহেতু কোভিড এবং অর্থনীতির ওপর তার অভিঘাত এবং তার থেকে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এই বিষয়গুলো থেকে সরে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি তাই আমরা ২০১৯ সালের তথ্য ব্যবহার করছি কোভিড-পূর্ববর্তী সময়ের শেষ বছর হিসেবে।

ধরা যাক মাথাপিছু ব্যয়ের মান অনুযায়ী মোট জনসংখ্যাকে ঊর্ধ্বমুখী ক্রমানুসারে সাজানো হল, যেখানে একদম তলায় আছেন সবচেয়ে দরিদ্ররা আর শীর্ষে আছেন সবচেয়ে ধনীরা। এবার ব্যয়ের মান অনুযায়ী সাজানো জনসংখ্যাকে ১০টি সমান ভাগে বিভক্ত করলে প্রত্যেকটি ভাগকে একটা দশমক (decile) বলা হয় । প্রথম বা নিম্নতম দশমকে আছেন জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্র দশ-শতাংশ আর দশম বা উচ্চতম দশমকে আছেন সবচেয়ে ধনীরা। প্রত্যেকটি দশমকের জন্যে আমরা গড় সাংসারিক ব্যয়, সেই দশমকের উচ্চতম ও নিম্নতম ব্যয়ের মান, এবং সঞ্চয়ের হারের তথ্য পাচ্ছি সিএমআইই-র সমীক্ষা থেকে।

প্রথমত, একটি পরিবার যত বেশি ধনী তার সঞ্চয়ের হারও তত বেশি। কাজেই, অল্প আয় পরিবারের বদলে উচ্চ আয় পরিবারে আয় বৃদ্ধি হলে, তার একটা বড় অংশ উপভোক্তা চাহিদায় না গিয়ে চলে যাচ্ছে সঞ্চয়ের খাতে।

গড় মাথাপিছু সাংসারিক ব্যয় ৫,৪০০ টাকার বেশি হলেই সেই পরিবার উচ্চতম দশমকের মধ্যে পড়ে, যেখানে পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা হল ৩। অতএব, ব্যয়ের নিক্তিতে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ-র মধ্যে যে প্রান্তিক পরিবার তার মাসিক সাংসারিক ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা ধরে নিতে পারি ১৬,২০০ টাকা এবং গড় সঞ্চয়ের

হার ৪৬ শতাংশ হওয়ায় তার ওপর ভিত্তি করে দশম দশমকের যে প্রান্তিক পরিবার অর্থাৎ, ব্যয়ের নিক্তিতে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ-এর মধ্যে পরিগণিত হতে গেলে যে ন্যূনতম আর্থিক সামর্থ্যের প্রয়োজন, তার যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা হল ৩০,০০০ টাকা মাসিক পারিবারিক আয়। বোঝাই যাচ্ছে, এই পরিবারকে খুব সচ্ছল বা ধনী বলা যায় না। তুলনামূলকভাবে যদি দেখি, ২০২০ সালে অগ্রগণ্য সফ্‌টওয়্যার সংস্থা ইনফোসিস-এ একজন সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারের মাইনে ছিল বার্ষিক ৪,৫০,০০০ টাকা, বা মাসে ৩৭,৫০০ টাকা। মনে রাখতে হবে এটা একা একজনের মাইনে এবং এর মধ্যে সঞ্চয় বা বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয় ধরা পড়বে না, তাই এক্ষেত্রে পারিবারিক আয় মাসে ৩৭,৫০০ টাকার থেকে বেশি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

কাজেই, এটা ধরে নেওয়াই যায় যে সংগঠিত ক্ষেত্রে দক্ষ প্রযুক্তি বা ম্যানেজারি কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক আয়ের শীর্ষ দশমকটিতে পড়ছেন। আবার শীর্ষ দুই দশমকের জনসংখ্যার সিংহভাগই শহরবাসী। 'মাঝের ভারত' (আয় বণ্টনের ২০ ও ৮০ শতাংশের মধ্যে যাদের অবস্থান) বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা মূলত এমন মানুষ যাঁরা হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোননি। এর অর্থ হল আপনি বড় শহরের বাসিন্দা হলে দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকারের গরিব মানুষদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আপনার খুবই কম, আর যাঁদের আপনি শহুরে গরিব বলে মনে করেন (যেমন আপনার বাড়ির রান্নার লোক বা ড্রাইভার), তাঁদের ভারতের আয় বণ্টনের নিচের দিকের তুলনায় উপরের দিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

আরও খেয়াল করে দেখুন, ভারতের অধিকাংশ মানুষ ঠিক কতটা গরিব। রঙ্গরাজন কমিটির হিসেবে ২০১১-১২ সালে ভারতের শহরভিত্তিক দারিদ্র্যরেখা ছিল মাথাপিছু ১,৪১০ টাকা (মাসিক ব্যয়ের নিরিখে), যা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ২০১৯ সালে এসে হওয়ার কথা ১,৯৮৪ টাকা। এবং সর্বশেষ হিসেবে অনুযায়ী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই দারিদ্র্যরেখার তলায় আছেন। আবার উচ্চতম দশমকের অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে মাথাপিছু মাসিক ব্যয়ের যে ন্যূনতম মান লাগে, তা খুব বেশি নয়— ৫,৪০০ টাকা (আগেই দেখেছি, যার থেকে আনুমানিক মাসিক পারিবারিক আয় হল তিরিশ হাজার টাকা) ।

এর থেকে দুটো কথা স্পষ্ট। প্রথমত, দেশে মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের বিস্তার কতটা: যাঁরা দারিদ্র্যরেখার তলায় পড়েন না, এমনকি যাঁরা অষ্টম বা নবম দশমকের মধ্যে পড়েন তাঁদেরও জীবনযাত্রার মান বেশ নীচে। দ্বিতীয়, জনসংখ্যার 'ধনীতম ১০ শতাংশ' কথাটা শুনলে যা মনে হয়, তা ঠিক নয়। এই শ্রেণীতেও অনেকেই আছেন যাঁদের মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নমধবিত্ত বলেই আমরা সাধারণভাবে উল্লেখ করি। ধরেই

নেওয়া যায় যে এই নিবন্ধটির পাঠকগোষ্ঠীর অধিকাংশই জনসংখ্যার শীর্ষ দশমকের অন্তর্ভুক্ত। আমরা অনেকেই নিজেদের 'মধ্যবিত্ত' ভাবতে ভালোবাসি, কিন্তু আন্তর্জাতিক হিসেবে ধনী না হলেও ভারতের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের মধ্যেই কিন্তু আমরা পড়ি। তবে এখানে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার— চ্যান্সেল এবং পিকেটি (২০১৯) দেখিয়েছেন, এই শীর্ষ ১০ শতাংশের মধ্যেও রয়েছে তীব্র অসাম্য। যাঁরা ধনী তাঁরা জনসংখ্যার ১ শতাংশের কম, আর যাঁরা অতিধনী তাঁদের অনুপাত আণুবীক্ষণিক। কিন্তু মোট জাতীয় আয়ের এঁদের ভাগ এঁদের জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় অনেকগুণ বেশি: যেমন, মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ যায় ধনীতম ১ শতাংশ-এর কাছে, আর জনসংখ্যার তলার অর্ধেক মানুষ মোট আয়ের মাত্র ১৩ শতাংশ অর্জন করে ।

সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা যে ভারতের মোট শ্রমশক্তির ১০ শতাংশেরও কম, তা মোটামুটি সর্বজনবিদিত। সফ্‌টওয়্যার পরিষেবার ক্ষেত্রে রপ্তানির প্রসারের ফলে ২০০০-২০১০-এর দশকে আয়ের উপর প্রাথমিকভাবে যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে তা মূলত এই শীর্ষ দুই দশমকের জনসংখ্যার ওপরেই সীমিত ছিল । এর থেকে পরের ধাপে আর্থিক বৃদ্ধির চুঁইয়ে পড়ার মাত্রা কতটা হবে সেটা নির্ভর করবে যাঁরা প্রাথমিকভাবে এই সচ্ছলতার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা ঠিক কী ধরনের পণ্য ও পরিষেবায় খরচ করছেন তার উপর। সেগুলি কি সেইসব পণ্য-পরিষেবা যা অদক্ষ তথা দরিদ্রতর শ্রমিকরা উৎপাদন করেন (যেমন খাদ্য, বস্ত্র, শ্রমনিবিড় পরিষেবা ইত্যাদি), নাকি সেগুলি এমন সব পণ্য-পরিষেবা যার উৎপাদন করছেন সুদক্ষ তথা সুউপায়ী শ্রমিকরা এবং যে কারণে সেসবে যুক্ত হওয়া অতিরিক্ত মূল্যের পরিমাণ অনেকটাই বেশি? ধনীতর উপভোক্তাদের কিন্তু অবশ্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, যেমন কাঁচা খাবার ইত্যাদির প্রয়োজন আগে থেকেই মিটে আছে। তাঁদের তরফে যে-কোনও পরিমাণ আয়বৃদ্ধিরই প্রভাব পড়বে সুদক্ষ শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত তুলনামূলকভাবে উচ্চমানের পণ্য ও পরিষেবার চাহিদায়।

এবার দেখা যাক, ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা— অর্থাৎ মোট ব্যয়ে ১ শতাংশ পরিবর্তন এলে কোনও ভোগ্যপণ্যের খাতে ব্যয় শতাংশ হিসেবে যতটা বদলায়— সেটা আয়ভিত্তিক শ্রেণীর নিরিখে কতটা এবং কীভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। জনসংখ্যার গ্রামীণ এলাকাবাসী নিচের পাঁচ দশমক এবং শহরবাসী শীর্ষের দুই দশমকের মধ্যে তুলনা করলে বৈপরীত্যটা আরও বেশি করে চোখে পড়ে।

সিএমআইই তথ্যাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে গৃহ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, মাসিক ঋণের কিস্তি, বিনোদন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, বিল ও বাড়িভাড়া, এবং শিক্ষা— এই

কয়টি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ধরনের পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রেই শহরবাসী ধনীতর উপভোক্তাদের ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা জনসংখ্যার নিচের দিকের ৫০ শতাংশ গ্রামীণ উপভোক্তাদের তুলনায় কম।

উল্লিখিত পণ্য এবং পরিষেবার সবক'টিই সুদক্ষ শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত তথা অতিরিক্ত মূল্যযুক্ত এবং সাধারণত নিয়মিত ক্ষেত্রেই এদের উৎপাদন হয়। নিচের পাঁচটি গ্রামীণ দশমকে খাদ্য, বস্ত্র, প্রসাধন, যাতায়াত, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন ধরনের খাত মিলিয়ে প্রায় সবরকম পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রেই ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি। অর্থাৎ, নিচের এই পাঁচটি গ্রামীণ দশমকে যে-কোনও ধরনের ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধি তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করবে নতুন একাধিক ব্যয়চক্র, যার মধ্যে নিয়মিত ক্ষেত্রের নানা পণ্য-পরিষেবার পাশাপাশি যথেষ্ট জায়গা নিয়ে থাকবে স্বল্পদক্ষ তথা স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের (নিচের পাঁচ দশমকের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা) উৎপাদিত নানান পণ্যও। এর ফলে যে বৃদ্ধির সৃষ্টি হবে, তার গতি হবে নিচ থেকে উপরে, এবং সেই কারণেই তা দীর্ঘস্থায়ীও হবে।

আরও খেয়াল করুন, সাধারণভাবে গ্রামবাসীদের ব্যয় স্থিতিস্থাপকতা শহরবাসীদের তুলনায় বেশি হয়, কারণ দেশের বেশিরভাগ গরিব মানুষ গ্রামেই বসবাস করেন। নিচের দশমকগুলির অন্তর্গত সিংহভাগ পরিবারই গ্রামবাসী।

বিনিয়োগকারীরা চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করছেন বলে যদি দেশের বাজারের উপর ব্যবসায়িক ভরসা কম বোধ করেন, তবে উচ্চ-আয় পরিবারদের প্রতি পক্ষপাতী আর্থিক বৃদ্ধি সেই সমস্যাকে আরও বাড়াবে বই কমাবে না। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির ধরনটি যেহেতু লক্ষণীয়ভাবে অসম, কোনও না কোনও সময়ে তার গতি মন্থর হয়ে আসা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তিন

আমাদের আলোচনাটিতে আয়বণ্টন এবং কার্যকরী চাহিদার (effective demand) যে কেন্দ্রীয় ভূমিকাটি দেখা যাচ্ছে, অর্থবিদ্যায় তার এক দীর্ঘ ও বরেণ্য ঐতিহ্য আছে যা মার্ক্স থেকে শুরু করে কেইনস্ এবং মিহাল কালেৎসকি পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্ক্স এর উল্লেখ করেছিলেন 'বাস্তবায়ন' (realisation) সমস্যা হিসেবে। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, 'সমস্ত প্রকৃত সংকটকালের মূলে সবসময়েই থেকেছে দারিদ্র্য এবং জনগণের উপভোগকর্মে বাধা পড়া' (সেবাস্তিয়ানি, ১৯৮৯)।

মূলধারার সমষ্টিগত বা ম্যাক্রো অর্থনীতিবিদরা ভাবেন পৃথিবীটা অসংখ্য আণুবীক্ষণিক কোম্পানিতে ভরা, যারা ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেয় শুধুমাত্র বাজারের দাম

এবং নিজেদের প্রান্তিক ব্যয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ভারতের মতো একটা দেশ, যেখানে জনসংখ্যার সিংহভাগ অনিয়মিত ক্ষেত্রে নিম্ন উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত এবং যেখানে বেশিরভাগ সংস্থায় কর্মীর সংখ্যা দশও ছাড়ায় না, সেখানে উৎপাদনশীলতা উন্নত করার ভারটা এসে পড়ে নিয়মিত ক্ষেত্রের উপরেই, যাদের নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসার এবং একটা মোটামুটি বিস্তৃতভাবে উৎপাদন চালানোর ক্ষমতা আছে। এমন একটা নিয়মিত ক্ষেত্র সাধারণত মুষ্টিমেয় কিছু বড় কর্পোরেট সংস্থার একচেটিয়া বাজার হয়ে ওঠে, যে বাজারে বিক্রেতা গুটিকয়েক, কিন্তু ক্রেতা প্রচুর। এই কারবারি সংস্থাগুলি প্রত্যাশিত মোট চাহিদা মাথায় রেখেই তার থেকে নিজেদের পণ্যের চাহিদা হিসাব করে থাকে। এখানে যেটা বলছি তা হল, কর্পোরেশনরা বিনিয়োগ করছে না বলে আর্থিক বৃদ্ধির হার শ্লথ হচ্ছে, এবং সেই সিদ্ধান্তের কারণ হল নতুন চাহিদা উৎপত্তির কোনও দিশা তারা দেখতে পাচ্ছে না।

কোনও অর্থনীতিতে অসাম্য ও শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য থাকলে বিনিয়োগে স্থবিরতা চলে আসার সমস্যাটি নিয়ে ১৯৪০ দশকের শেষদিকে যুদ্ধোত্তর ইতালির প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন পল রোজেনস্টাইন-রোডান। একটা জুতোর কারখানার গল্প দিয়ে সমস্যাটা ব্যাখ্যা করেন তিনি। কারখানার সিইও ভাবছেন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি আরও বিনিয়োগ করবেন কিনা। আরও শ্রমিক নিয়োগ করলে, শ্রমিকদের আয় বাড়বে, কিন্তু সেই বর্ধিত আয়ের একটা খুব ছোট অংশই তারা জুতো কিনতে ব্যবহার করবে। যদি এমন হয় যে শুধু তিনিই একমাত্র উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন? যদি অন্য কোনও ব্যবসায়ী তাঁর উদাহরণ অনুসরণ না করে, তবে তাঁর জুতো কিনবেই বা কে? এবার প্রত্যেক সিইও-ই যদি এইভাবে ভাবেন এবং সিদ্ধান্ত নেন নিজের নিজের কারখানায় উৎপাদন তাঁরা বাড়াবেন না, অর্থনীতিতে স্থবিরতা আসবেই।

রোজেনস্টাইন-রোডান এক্ষেত্রে বলছেন যে এই সমস্যার একটা সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে সরকারের তরফে একটা 'বড় ধাক্কা', যার মাধ্যমে সরকার নানা ক্ষেত্রের সমস্ত কর্পোরেশন কর্তৃক সমস্ত বিনিয়োগের মধ্যে একটা সমন্বয় তৈরি করবে। এতে করে কারবারি সংস্থাগুলি আশ্বস্ত হবে যে মোট চাহিদায় একটা বড়সড় বৃদ্ধি আসতে চলেছে এবং তাদের অর্থনীতির উপর ভরসা রাখা দরকার। এটা কাজ করার জন্য সরকারকে বেসরকারি বিনিয়োগসমূহের সমন্বয়ের কাজটা করতে হবে অত্যন্ত নিপুণভাবে এবং বহিরাগত হস্তক্ষেপ এড়িয়ে।

চার

একটা সামগ্রিক চাহিদা তৈরি করতে গেলে দেশের মধ্যেই স্বয়ংনির্ভর একটা চাহিদা তৈরি করতে হবে। এখন, ভারতবর্ষে তা আদৌ কতটা সম্ভব? এর উত্তর খুঁজতে হবে ওই ধনীতম দশ শতাংশের বাইরে গিয়ে, যেখানে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বাস করেন, অর্থাৎ গ্রামীণ ভারতে এবং নগরাঞ্চলের মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাস করেন গ্রামে। মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। এবং মনে রাখতে হবে যে এই দুইটি শ্রেণী পরস্পর-বহির্ভূত নয়। আয়ের নিরিখে দেশের ধনীতম দশ শতাংশ বাদ দিলে বাকি ৯০ শতাংশ এই দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৫০ শতাংশ আসে অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। আর গ্রামীণ ভারতের মোট আয়ের ৩৯ শতাংশ কৃষি থেকে আসে, বাকি আসে বাকি গ্রামীণ শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি থেকে যাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে কৃষির লাভ-লোকসানের ওপর নির্ভরশীল। যখন কৃষক কিছুটা লাভের মুখ দেখেন, তখন তাঁরা একদিকে যেমন স্থানীয় স্তরে পণ্য কেনাকাটি করেন, তেমনি শহরাঞ্চলের বসতিবাজার থেকেও পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হন। ভারতীয় কৃষির নিম্নগামী উৎপাদনশীলতা, ফসলের নির্বাচন নিয়ে সমস্যা, দুর্বল গ্রামীণ পরিকাঠামো, বাজারের সঙ্গে সংযোগের সমস্যা— এইসব বিষয় মাথায় রাখলে একথা স্পষ্ট যে কৃষিক্ষেত্রে কিছু সত্যিকারের কাজ করার সুযোগ ও প্রয়োজন দুই-ই চোখের সামনে মজুত।

এখানে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে গ্রামীণ আয় বাড়ানোর বিষয়টা। শুধু উৎপাদনের কথা ভেবে গেলেই চলবে না। মিশ্র কৃষিপদ্ধতিগত জায়গায় আশু পরিবর্তনগুলো না সাধন করে শুধুই ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা করে গেলে দাম পড়ে যাবে এবং গরিব কৃষকের দারিদ্র্য আরও জেঁকে বসবে। মিশ্র কৃষিতে কিছু বদল এনে শহর এলাকায় গ্রামীণ পণ্যের চাহিদা তৈরি করা গেলে কৃষক আয়ের মুখ দেখবেন। শস্যের পাশাপাশি উদ্যানপালন, দুগ্ধজ শিল্প, সুরা (ওয়াইন), পোলট্রি ইত্যাদি আয় বাড়াবে। অর্থাৎ, চাষবাসের ক্ষেত্রের মধ্যেও একটা অবস্থান্তর হতে পারে, বিশেষত কম আয়ক্ষেত্রগুলিতে। যথা— মূলত শস্যনির্ভর চাষ-আবাদের সঙ্গে ফল, সবজি, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চাষের দিকে যাওয়া। লক্ষ লক্ষ কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা যেখানে শস্য চাষে আটকে থাকেন, এই বহুবিধ দিকগুলো তাঁদের সামনে আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ উপস্থাপিত করতে পারে।

তবে এই বিবিধকরণের জন্য যথেষ্ট গবেষণা ও প্রচার দরকার। গ্রামীণ পরিকাঠামো, হিমঘর, ঋণ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি নানারকম সহযোগিতা দরকার যাতে বাজার

প্রশস্ত হয়। এর ফলে স্থানীয় পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে পণ্যেরও একটা গ্রামীণ চাহিদা বাড়বে— শহরের বর্ধিত আয় একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালু রাখবে, তেমনই গ্রামীণ বর্ধনশীল আয় শহরের পণ্যের চাহিদাকেও ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। এই ব্যবস্থার স্বাস্থ্যকর অভিঘাতে বৃদ্ধি স্থায়ী হবে।

যেহেতু অর্থনীতির জাগরণের ক্ষেত্রে জনমানস খুব বড় একটা উপাদান, তাই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সারা দেশ আজ যে হতাশায় আচ্ছন্ন, তা কি এই গ্রামীণ বৃদ্ধি নীতি দূর করতে পারবে? আমরা ভরসা করে উত্তর দিতে পারি, হ্যাঁ পারবে।

ইদানীংকালে নিয়মিত কর্মসংস্থানগুলি কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমজোগানকে খুব একটা জায়গা দিতে পারছে না। এর ফলে জনপ্রতি আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি একটা হতাশাগ্রস্ত, ঝিমিয়ে পড়া যুবসমাজ তৈরি হচ্ছে। কোনও দেশ কিন্তু জনসংখ্যার সদ্ব্যবহারের এমন সুযোগ চট করে পায় না। ভারত তার সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। যদি গ্রামীণ অর্থনীতি মাথাচাড়া দিতে থাকে, তাহলে উৎপাদন ক্ষেত্রে, নির্মাণ শিল্পে স্থানীয় চাকরি তো তৈরি হবেই, পাশাপাশি গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পেলে শহরের নিয়মিত সংস্থানগুলিও বিনিয়োগ ও কর্মী নিয়োগ ইত্যাদি শুরু করবে। এইরকম একটা প্রক্রিয়া শুরু হলে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা— সকলেই মনসিকভাবে চাঙ্গা হবে।

পাঁচ

সারকথাগুলো আরেকবার বলে নেওয়া যাক। গ্রাম-কেন্দ্রিক বৃদ্ধির যে নীতি নিয়ে আলোচনা করলাম তা তিনটে ভিন্ন অথচ সংযুক্ত ভাবনাবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা ভাবনাবিন্দুই একটা স্তিমিত সামগ্রিক চাহিদার পরিবেশকে মাথায় রাখে।

প্রথমত, স্বনির্ভর আয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি জনসংখ্যার দরিদ্রতর অংশের কাছে পৌঁছলে সামগ্রিক চাহিদার ক্ষেত্রে তা একটা জোয়ার আনবে, কারণ গরিব মানুষ তাঁর এই বর্ধিত আয়ের একটা বড় অংশ খরচ করতে চাইবেন।

দ্বিতীয়ত, গরিব মানুষ তাঁর এই বর্ধিত আয় খরচ করতে চাইবেন সেইসব পণ্যের জন্যে যা স্বল্প প্রশিক্ষিত শ্রমিকের তৈরি। এর একটা ফলপ্রসূ দিক আছে সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে।

তৃতীয়ত, নীতিগত যে সমাধানসূত্র আমরা ভাবতে চাইছি তা গ্রামীণ ও শহরের চাহিদার মধ্যে একটা পরিপূরক আবর্তন তৈরি করবে, যার ফলে বৃদ্ধি যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে। যখন নীতিগত হস্তক্ষেপে গ্রামীণ মিশ্র কৃষিতে বদল আসবে, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা শহরের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করবে। শহরে চাহিদার বৃদ্ধির অনুপাতে গ্রামীণ উৎপাদক সংখ্যাও বাড়বে। শীর্ষ দুই দশমকের শহুরে ক্রেতাদের তুলনায় গ্রামের

জনসংখ্যার, বিশেষত আয়ক্ষমতার নিচের অর্ধের মানুষজন তাঁদের বর্ধিত আয়ের একটা বড় অংশ শহরে উৎপাদিত পণ্য কিনতে ব্যয় করেন। তাই এই নীতির ফলে বর্ধিত আয়ের কারণে শহরে উৎপাদিত পণ্যেরও একটা চাহিদা তৈরি হবে যার ফলে শহুরে আয়ও একইসঙ্গে বৃদ্ধি পাবে।

এই ওপরের প্রস্তাবগুলির একটিও কিন্তু এই দাবি করে না যে রপ্তানিভিত্তিক আয়ের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার সংস্কারের মতো প্রচলিত প্রস্তাবগুলো এখনও যথেষ্ট বৈধ। তা সত্ত্বেও, গ্রামীণ উন্নয়ন এতদিন যথেষ্ট অবহেলিত হয়ে এসেছে, এবং পুনর্বিবেচনা খুবই জরুরি। এতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির প্রক্রিয়াকে খানিকটা অক্সিজেন জোগাবে এই প্রস্তাবগুলি।

তবু, এও অনস্বীকার্য যে দ্রুত বৃদ্ধির হার যাদের (৫ শতাংশ জনপ্রতি আয়ের প্রকৃত বৃদ্ধির হার বা তার বেশি), সেই পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি অনেকদিন ধরে রপ্তানিনির্ভর বৃদ্ধির নীতি লাগু করে রেখেছে। দেশীয় চাহিদার ওপর নির্ভরশীল গ্রামীণ নেতৃত্বে বৃদ্ধি হয়ত এত উঁচু বৃদ্ধির হার দেবে না। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পক্ষে লাভদায়ক দ্রুত বৃদ্ধির থেকে দীর্ঘস্থায়ী এবং জনসংখ্যার নীচের স্তর পর্যন্ত উপকৃত হবে এমন ধীরগতির বৃদ্ধি অধিক কাম্য।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই লেখাটি লেখার জন্যে দ্যুতি মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। অশোক কোতয়াল ও ভরত রামস্বামী-র সাথে আমার যৌথ একটি প্রবন্ধের (ঘটক, কোতয়াল, রামস্বামী, ২০২০) ওপর লেখাটি আংশিকভাবে ভিত্তি করে লেখা । অশোক কোতয়ালের ২০২২ সালে জীবনাবসান হয়। এই লেখাটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।]

তথ্যসূত্র

Lucas Chancel, and Thomas Piketty. 2019. ''Indian Income Inequality, 1922-2015: From British Raj to Billionaire Raj?'' Review of Income and Wealth 65: S33-S62.

Maitreesh Ghatak, Ashok Kotwal, and Bharat Ramaswami (2020). ''What Would Make India's Growth Sustainable?'' (*The India Forum*, August 15, 2020)

Ashok Kotwal, Bharat Ramaswami, and Wilima Wadhwa (2011). ''Economic liberalisation and Indian economic growth: What's the evidence?'' Journal of Economic Literature 49 (4): 1152-99.

Paul Rosenstein-Rodan (1943): ''Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe'', *Economic Journal*, Volume 53, No. 210/211, pp. 202-11.

Mario Sebastiani (1989). ''Kalecki and Marx on Effective Demand''. *Atlantic Economic Journal* 17: 22-28.